শমীক সরকার

ব্যক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

১

আমরা যেভাবে ব্যক্তি কথাটা ব্যবহার করি— তাতে মনে হয়, ব্যক্তি হল একটা বাস্তবতা। জল, মাটি, সূর্য, পেনসিল ইত্যাদি যেমন আছে, ব্যক্তিও তেমনই আছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিগত ব্যাপার ইত্যাদি শব্দ আমরা যেভাবে ব্যবহার করি, তাতে যেন মনে হয়, ব্যক্তি হল বাস্তব অস্তিত্ব। ব্যক্তির এই বাস্তব অস্তিত্বের ভাবনা আজগুবি নয়। সত্যি সত্যিই ব্যক্তিই জন্মায়, মারা যায়, খায়, দায়, ঘুমায়, পেচ্ছাপ-পায়খানা করে ইত্যাদি। ব্যক্তিরই নাম হয়, নামকরণ হয়, ফাঁসি ইত্যাদি হয়। শুধু এসবই নয়, সব ব্যক্তি যে একইরকম নয়, সে তো দেখাই যায়। সেই কারণে আমরা ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদিও দেখতে পাই। অর্থাৎ ব্যক্তি শুধু বাস্তব অস্তিত্ব নয়। সে বাস্তব জীবন্ত অস্তিত্ব। সেই পছন্দ-অপছন্দ আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়ও। ফলে সে বাস্তব জীবন্ত অস্তিত্বই শুধু নয়, পরিবর্তনশীলও বটে। ফলত তাকে বিষয়ীর স্থান দিতে আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। এমনকী পরম বিষয়ীও বলা যেতে পারে— সবার উপরে ব্যক্তি সত্য, তাহার উপরে নাই। যেমন ধরা যাক, আমি কাউকে বললাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। শুনে সে আমায় বলতেই পারে, তুমি আমায় ভালোবাসো মানে? আমি কি একটা ফুটবল বা ক্রিকেট ব্যাট বা বাঁশি বা সেলিব্রিটি, যে চাইলেই আমায় ভালোবাসা যায়? জুতিয়ে গাল লাল করে দেব। এখানে ভালোবাসা ক্রিয়াপদটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার জায়গায় খাওয়া, দেখা, ঘৃণা করা ইত্যাদি যে কোনও ক্রিয়াপদ ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু মূল গন্ডগোলের জায়গাটা হল— 'তোমাকে'। এই তোমাকে শব্দটার মধ্যে দিয়ে তুমি-র বিষয়করণ করা হল। অর্থাৎ, আমি ভাত খাই। এই বাক্যে ভাতের অস্তিত্ব যেমন, তেমনি আমি তোমাকে ভালোবাসি-র মধ্যে তুমি-র অস্তিত্ব। ফলে, খুব স্পেশাল কেউ ছাড়া (অর্থাৎ যার কাছে ওই কথাটি প্রত্যাশিত) কাউকে যদি গিয়ে বলা হয়, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাহলে পরিস্থিতি ঘোরালো হবে। আর অন্য কিছু বললে তো কথাই নেই। সামাজিকে তো বটেই, বিচারব্যবস্থাতেও এসবকে ভালো চোখে দেখা হয় না। তাহলে যেটা দাঁড়াল, তা হল— ব্যক্তি শুধু বাস্তব অস্তিত্ব নয়, বিষয়ী অস্তিত্ব।

ইংরেজিতে ব্যক্তি বলতে দুটি জিনিসকে বোঝানো হয়। এক, পারসন। দুই, ইন্ডিভিজুয়াল। আর বাংলায় ব্যক্তি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে এবং যার মানে হল, বিশেষভাবে প্রকাশিত কিছু। সংস্কৃতে অনৃজ ধাতু-র (মানে, প্রকাশ পাওয়া) আগে

বি উপসর্গ বসে ব্যক্তি। সংস্কৃত ব্যুৎপত্তির মূল ব্যাপারটা হল, যা একটি নির্দিষ্ট কিছু বা বিশেষ হিসেবে প্রকাশিত, সেটাই ব্যক্তি। পৃথক প্রকাশ। এই সংস্কৃত ব্যুৎপত্তির সঙ্গে কিছুটা মেলে ইংরেজি ইন্ডিভিজুয়াল শব্দটি। ইন্ডিভিজুয়াল মানে হল, যাকে আর ভাঙা যায় না। একক অস্তিত্ব, বিশেষ অস্তিত্ব। কিন্তু একটু খেয়াল করলে একটা ফারাকও পাওয়া যায় ব্যক্তির ইংরেজি এটিমোলজি এবং সংস্কৃত ব্যুৎপত্তির। সেটা হল, ইংরেজি শুনে যেন মনে হয়, ভাঙতে ভাঙতে এসে আর যখন তাকে ভাঙা যায় না, সেটাই ব্যক্তি। যেন বা অ্যাটম বা পরমাণুর মতো। আর সংস্কৃত শুনে মনে হয়, একটি পৃথক প্রকাশ হল ব্যক্তি। ইংরেজি ইন্ডিভিজুয়াল হল অনেকের মধ্যেকার একক অস্তিত্ব। যেন বা, অনেক বা সমস্তকে ভাঙতে ভাঙতে এই অবধি আসা গেছে। এরপর আর ভাঙা সম্ভব নয়। যদিও ইন্ডিভিজুয়াল এবং ইন্ডিভিজুয়েশন বিষয়ে চর্চা পড়লে পরিষ্কার হয় যে ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়। ইন্ডিভিজুয়ালের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ইন্ডিভিজুয়েশন। ব্যক্তিকরণ। অবয়বের দিকে যাওয়া। পৃথকীকরণ। একটা আকারের দিকে যাওয়া। একটা গঠনের দিকে যাওয়া। একটা প্রকাশের দিকে যাওয়া। ইন্ডিভিজুয়ালকে গুরুত্ব দিলে, তার গঠনকে না ধরলে বা তাকে স্বয়ম্ভু ভাবলে একটা ভাবনা আসে বটে— যেন বা যাকে আর ভাঙা যাবে না তার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তা না করলে বোঝা যায়, সেরকম নয়। সংস্কৃত বা বাংলা ব্যক্তি এবং ইংরেজি ব্যক্তির মধ্যে কোনও তফাত নেই— যদি ব্যক্তির ইংরেজি হয় ইন্ডিভিজুয়েটেড। ব্যক্তির ইংরেজি ইন্ডিভিজুয়াল ধরলে একটা গোলমালের অবকাশ থাকে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ফরাসি দর্শনের বাস্তুতন্ত্র থেকে উঠে এসেছিল ইন্ডিভিজুয়াল এবং ইন্ডিভিজুয়েটেড-এর তফাতের কথা। ইন্ডিভিজুয়েটেড বা ব্যক্তির দ্বিতীয়বার ইন্ডিভিজুয়েশনের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় ইন্ডিভিজুয়াল। অর্থাৎ ব্যক্তির প্রকাশ বা অবয়বের ফের একবার যদি ইন্ডিভিজুয়েশন বা ব্যক্তিকরণ হয়, তবে ইন্ডিভিজুয়াল তৈরি হয়। এবং এই দ্বিতীয়বার ইন্ডিভিজুয়েশন মোটেই ভৌত বা ফিজিকাল নয়। মনোসামাজিক-ও (সাইকোসোশাল) নয়। মনোজাগতিক (সাইকিক)। ফরাসিতে দুটি কথা আলাদা। অ্যাঁদিভিদু। অ্যাঁদিভিদুয়েল। প্রথমটির মানে ইন্ডিভিজুয়েটেড। ব্যক্তি। আর দ্বিতীয়টির মানে ইন্ডিভিজুয়াল। কিন্তু বাংলা মানে? খুব কষ্ট করে আমরা মানে করতে পারি ব্যক্তিগত। কিংবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। অর্থাৎ, ব্যক্তি হল ভৌত (এবং মনোসামাজিক) প্রকাশ। আর ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হল মনোজাগতিক।

২

এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে, 'ব্যক্তি' বলতে প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা যেটা বলেছি, সেখানে ব্যক্তি আর ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মিলেমিশে গেছে এবং তাদের পৃথকীকরণ প্রয়োজন। এই পৃথকীকরণ হয়তো সংজ্ঞাগতভাবে আমরা দেখেছি আগের পরিচ্ছেদে। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এই পার্থক্যটি কেমন? এজন্য আমরা একটা ক্ষেত্রকে বেছে নিই বরং— সেটা হল দোষী এবং তার শাস্তি। শোনা যায়, শ্রমবিভাজিত (এবং শ্রেণিবিভাজিত) সমাজের আগেকার কিছু সমাজে বিচারে অপরাধীর শাস্তি হত না। সে অপরাধী সাব্যস্ত হত। এবং সে বাদ দিয়ে বাকিরা লজ্জিত হত (কোনও রিচুয়ালের মাধ্যমে) তার কৃত সেই অপরাধের জন্য— যে কেন বাকিরা তাকে অপরাধী হওয়া থেকে বিরত করতে পারেনি বা এরকম কিছু।

সেটাই ছিল অপরাধীর 'শাস্তি'। শ্রমবিভাজিত, শ্রেণিবিভাজিত এবং রাষ্ট্রওয়ালা সমাজে অপরাধীর ভয়ংকর সব শাস্তির কথা আমরা শুনেছি। অর্থাৎ, তখন আর অপরাধীর অপরাধের দায় বাকিরা স্বীকার করত না, বা বলা ভালো, বিচারে তার কোনও জায়গা ছিল না। অপরাধের দায় হয়ে গেল পুরোপুরিভাবে অপরাধীর। সেই ব্যক্তির। এখানে বলাই বাহুল্য, ব্যক্তি আর কেবল ব্যক্তি নয়, সে হয়ে গেল ব্যক্তিগত। তাকে বানানো হল— সেটাও বলা যেতে পারে। ব্যক্তির ব্যক্তিগতকরণ হল। কিন্তু এখানে ব্যক্তির ভেতর থেকে হল না। বাইরে থেকে হল। বাইরে থেকে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হল ব্যক্তিগত-কে। শ্রেণীবিভাজিত হওয়া সমাজের এই গিল্টকে মাথায় রেখেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার"। যাকগে। তবে এখানেই শেষ হল না। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে দেখা গেল— অনেকেই সেরকম দোষী বা অপরাধী নয়, যে কাজির বিচারের কোপে পড়বে, বা দেখা গেল ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল, রাষ্ট্র ধরতে পারল না— তাদেরও ছাড় নেই। বস্তুতপক্ষে কারওরই ছাড় নেই। দেড় হাজার বছর আগে খ্রিস্টধর্ম এল এবং সঙ্গে নিয়ে এল এক মজার ব্যাপার। ধর্মপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি ও পাপস্খালন— এবং তা সব ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। এর জন্য অপরাধ বা দোষ করতে হয় না। বা না করলেও চলে। বা করল কি না করল, তাতে কিছুই এসে যায় না। বিচারব্যবস্থার থেকে বিযুক্ত হল এই ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি এবং পাপস্খালন। অপরাধ বা দোষ এসে দাঁড়াল ব্যক্তিগত পাপ-এ। এইটা আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যক্তিগতকরণে সীমাবদ্ধ রইল না, ব্যক্তির ভেতর থেকে ব্যক্তিগতকরণের গতি তৈরি হল। অবশ্যই বাইরের প্রভাবে। সেকথা আলাদা। কিন্তু ব্যক্তির ভেতর থেকে ব্যক্তিগতকরণের এই গতিসঞ্চার অবশ্যই মনুষ্যসমাজের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

এই ব্যক্তিগত প্রায় কখনওই আর প্রশ্নের মুখে পড়েনি ব্যাপকভাবে। এটা অবশ্য ইউরোপের কথা বলা হচ্ছে। অন্যান্য সভ্যতায় কী হয়েছিল ঠিক, তার অনেকটাই অজানা, অন্তত আমার জানা নেই। অপরাধী, শাস্তি, পাপী— এইভাবে ব্যক্তিগত-র যে যাত্রা শুরু হল, তা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য সব সামাজিক পরিসরে। (রাজনৈতিক) অর্থনীতি যখন আলাদাভাবে তত্ত্বায়িত হল— তখনও সমাজকে দেখার যে ভঙ্গিটা দাঁড়াল— ব্যক্তিগত মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে সংকুচিত করে অর্থনৈতিক মানুষ-এর ধারণা নিয়ে আসা হল, অর্থনীতির একক হিসেবে। অর্থনীতির সমালোচনা যখন হল, তখনও তা সমাজের ব্যক্তিগত একক-কে প্রশ্ন করেনি, বরং ব্যক্তিগত মানুষকে অর্থনীতির সংকোচন থেকে মুক্তির কথাই এসেছে। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে মার্কস-এঙ্গেলস লিখেছিলেন— "পুরনো বুর্জোয়া সমাজ, যেখানে শ্রেণি এবং শ্রেণিবৈরিতা রয়েছে, তার বদলে আমাদের [কমিউনিস্ট সমাজ] হবে একটা সংঘ, যেখানে প্রত্যেকের মুক্ত উন্নয়ন হবে সবার মুক্ত উন্নয়নের পূর্বশর্ত।" যদিও ফলিত সমাজতন্ত্রগুলির সংবিধান এবং তার রূপায়ণে ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বাধীনতা তেমন কিছুই ছিল না। যে কারণে একদিকে ফলিত সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা, মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা এবং আরেকদিকে ইউরোপের ফ্যাসিবাদের অভিজ্ঞতা— এই দুয়ের সমালোচনায় উদার অর্থনীতির ভেতর থেকে নয়া-উদার অর্থনীতির ধারণাগুলি তৈরি হয়। সেখানেও ব্যক্তিগত মানুষ একক। নয়া-উদার অর্থনীতির যুগ শুরু হয় অবশ্য আরও পরে, আটের দশক থেকে। প্রায়

সারা পৃথিবীকে তা প্রভাবিত করে এবং তাকে নিজের আদলে গড়ে নিতে থাকে। আমাদের মতো দেশগুলিতে তা আসে 'বিশ্বায়ন'-এর রূপ নিয়ে, আটের দশকের শেষ দিকে, এবং সরকারি সিলমোহর পায় নয়ের দশকের শুরুতে।

ফলে বলা যেতে পারে, সমাজের মৌলিক একক হল ব্যক্তিগত মানুষ— এই ধারণা থেকে কখনওই সরে আসেনি সভ্যতা। বিশেষত পশ্চিমি সভ্যতা। এবং গত কয়েকশো বছর ধরে পশ্চিমি সভ্যতাই ধীরে ধীরে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে অন্যান্য সভ্যতাগুলিকে। তবে ব্যক্তিগত মানুষের বিষয়ীত্ব, যার কথা আমরা একদম শুরুতে বলেছি, তা নিয়ে কিছু সূক্ষ্ম রকমফের ঘটেছে— ধারণায় এবং প্রয়োগে। যেমন, সমাজের সামূহিক গঠনগুলিতে (সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত, কাউন্সিল, পার্টি, অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি) জোর দিয়ে যে সমস্ত রাষ্ট্র ও সংবিধান গঠিত হয়েছে বা চলেছে— সেগুলিতে ব্যক্তিগত মানুষকে ধারণা করার চেষ্টা করা হয়েছে যৌক্তিক বিচারবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে। আর বাকিগুলিতে ব্যক্তিগত মানুষ তুলনায় ক্ষুদ্রতর, তুলনায় আরও সাধারণ বা পাতি। যেমন, নয়া-উদারবাদের ব্যক্তিগত মানুষ ক্ষুদ্র মানুষ। সে অর্থনীতির বিষয়, অর্থনীতিকে ভগবান মেনে চলে, কিন্তু সে কোনও মানুষের বিষয় নয়। ফলে "আমি তোমাকে ভালোবাসি" শুনলে সে রেগে যেতেই পারে। কিন্তু "পয়সা যার, উচ্চশিক্ষা তার" শুনলে তার রেগে যাবার কথা নয়। এমনকী অর্থনীতি ছাড়া অন্য আর কোনও ফ্যাক্টরকেও সে ব্যক্তিগত-র চেয়ে বড় বলে স্বীকার করে না। "আমি তোমার জন্য বিদেশ যাইনি" বা "আমি দেশকে ভালোবাসি বলে বিদেশ চলে যাইনি" শুনলে সে ক্ষুণ্ণ হবে বা অবাক হবে বা অন্যরকম বলে ভাববে, কিন্তু "আমি পয়সা ছিল না বলে বিদেশ যেতে পারিনি" শুনলে সে সেটা স্বাভাবিক বলে মনে করবে।

২

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (কৃবু) এবং যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা (যাবু) আসছে এই পটভূমিতে। প্রথমত, যাবু কোনও নতুন ধারণা নয়। কম্পিউটার বা তার আদি রূপ 'অ্যানালিটিকাল মেশিন' শুরুই হয়েছিল যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। যন্ত্র যে মানুষের চেয়ে বেশি স্মার্ট, বেশি বুদ্ধিমান, বেশি সংবেদনশীল হয়ে যাচ্ছে— এগুলো বহুদিন থেকেই মানুষের কল্পনা। এখনকার 'বিগ হিরো সিক্স' সিনেমা আর আটের দশকের 'জনি সোকো অ্যান্ড হিজ ফ্লাইং রোবট' সিরিয়াল— এগুলোর মধ্যে মৌলিক কিছু তফাত নেই। কিন্তু যাবু-র জাদু শুরু হল এই বছর দশেক হল হয়তো। সেটার একটা বড় কারণ কম্পিউটিং, অর্থাৎ অনেক কাজ দ্রুত করে ফেলার ক্ষমতার উন্নতি, বা এক কথায় বলতে গেলে কম্পিউটারের উন্নতি। এবং দ্বিতীয় ও সবচেয়ে ক্রিটিকাল বা আসল কারণ হল— মানুষের মস্তিষ্কের আদলে কম্পিউটিং-এর উন্নতি। এই কৃত্রিম স্নায়ুজাল বা আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক যান্ত্রিক শিক্ষণ বা মেশিন লার্নিং, যার পোশাকি নাম ডিপ লার্নিং— সেটাই গত দশ বছরে উন্নত হয়েছে বহু গুণ। কীভাবে মানুষ বহু জিনিসের মধ্যে থেকে চোখে দেখে একটা নির্দিষ্ট জিনিসকে আলাদা করে, কীভাবে একবার বাঘ দেখলে দ্বিতীয়বার সে ঠিক বাঘ চিনে নিতে পারে যদি এক ঝলকও দেখে তা-ও, কীভাবে মানুষ ভাষা শিখে নেয় শুনতে শুনতে, কীভাবে মানুষ কোনও জিনিসের বা কথার বা পরিবর্তনশীল

ব্যক্তির আদল বানিয়ে রাখে মাথায়— সেগুলিকে নকল করে করেই গভীর শিক্ষণ বা ডিপ লার্নিং-এর নির্দেশতন্ত্র বা প্রোগ্রামগুলি বানানো হয়েছে। যার মধ্যে যুক্তি এবং অযুক্তি দুইয়েরই মিশেল ঘটানো হয়েছে। এইভাবে মুখের ভাষা বোঝা, কথোপকথন চালানো, ছবি দেখে আলাদা করা তাতে কী কী দেখা যাচ্ছে, অঙ্কন-সুর-গান-কবিতা-গল্পের মতো 'সৃজনশীল' জিনিস বানানো ইত্যাদির নির্দেশতন্ত্রের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু কাজ মানুষের থেকে ভালো পারছে এই গভীর শিক্ষণ-ভিত্তিক নির্দেশতন্ত্রগুলি। এই জন্যই ভয় হচ্ছে— কৃবু রোবটগুলি মানুষের কাজ কেড়ে নেবে। এই নয়া নির্দেশতন্ত্রগুলি দুইভাবে আলাদা আগের সফটওয়্যারগুলি থেকে। প্রথমত, যেটা আগেই বলা হল— এগুলি মানুষের মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতিকে নকল করে বানানো। দ্বিতীয়ত, এগুলি শিক্ষণ-ভিত্তিক বা লার্নিং বেসড্। অর্থাৎ, এগুলি যত কাজ করবে, তত শিখবে। মানুষ যেভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেভাবেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে প্রাজ্ঞ হবে এই নির্দেশতন্ত্রগুলি। ফলে মানুষের মধ্য-মস্তিষ্ক— যা মানসিক সিদ্ধান্তগুলি নেয়, যেমন ছবি দেখে চেনা, গান শুনে চেনা, কথোপকথন করা, ইত্যাদি— তার কাজগুলি তো করবেই, তার সাথে সাথে এগুলি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিখবেও, যা মানুষের মস্তিষ্কের বাইরের পাপড়িসদৃশ অংশের কাজ। এইভাবে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যভাগ ও পরিধির নকল হিসেবে এই নয়া নির্দেশতন্ত্রগুলি জন্ম দিচ্ছে যাবু নির্দেশতন্ত্রের এবং যাবু সফটওয়্যারের। যখন সফটওয়্যার প্রথম এসেছিল— তখনও তা সম্পর্কে সমালোচনা হয়েছিল, যে সেগুলি মানুষের কাজ কেড়ে নেবে। বস্তুত হয়েওছে তাই। অফিস সফটওয়্যারগুলির কারণে অফিসে করণিক এখন অনেক কম লাগে। কম সময়ে অনেক কম লোক দিয়ে অনেক বেশি কাজ করা সম্ভব হয়। এই যাবু সফটওয়্যারগুলি এইভাবে মানুষের আরও অনেক কাজ করে ফেলবে মানুষের চেয়ে অনেক ভালোভাবে। বহু প্রফেশনালের কাজ না-থাকার কথা। তার মধ্যে শিক্ষক থেকে ডাক্তার, প্রোগ্রামার থেকে মিউজিশিয়ান, স্ক্রিপ রাইটার থেকে থেকে ট্রান্সলেটর— অনেকেই আছে। কিন্তু এটা প্রাথমিক দুশ্চিন্তা মাত্র।

আসল দুশ্চিন্তা এর থেকেও গভীরের। মানুষের মস্তিষ্কের ক্লোন এই যাবু রোবটগুলি হয়ে দাঁড়াবে মানুষের থেকেও বেশি করে জাগতিক মানুষ। এম্পিরিকাল মানুষ বা জাগতিক মানুষ যেমন হয়— তেমনভাবেই বানানো হয়েছে এইগুলিকে। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে আরও বেশি তা হয়। ফলে মানুষের চেয়েও পারফেক্ট হবে তারা। হয়ে দাঁড়াবে ব্যক্তিগত মানুষের আদর্শ। ঠিক যেমন ব্যক্তিগত মানুষ হওয়া উচিত। তারা যুক্তি থেকে শুরু করে সংবেদন— সব দিক থেকে হয়ে দাঁড়াবে ব্যক্তিগত মানুষের থেকে অনেক বেশি দড়। যা কিছু শেখা যায় (পেডাগজিকাল), তা তারা মানুষের চেয়ে অনেক ভালো শিখবে। তারা হবে অনেক বেশি কেয়ারিং, অনেক বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি মেধাবী— সংক্ষেপে, অনেক বেশি ঠিকঠাক।

এছাড়াও এই যাবু রোবটগুলি নিজেরাই নিজেদের জন্য আরও নতুন নতুন নির্দেশতন্ত্র লিখে ফেলতে সক্ষম। ফলে তারা হয়ে উঠবে মানুষের থেকে স্বাধীন অস্তিত্ব। মানুষ যেহেতু এদের কাজে লাগাতে চায়, তাই মানুষ এদের 'অফ' করতে পারবে না। সেই অবকাশে এরা নিজেরাই নিজেদের উদ্দেশ্য, বিধেয়, কার্যকারিতা সব পরিবর্তন করে নিতে পারবে। এবং মনুষ্যসমাজের মধ্যে থেকেই একটি

স্বাধীন প্রজাতি হিসেবে উঠে দাঁড়াবে, যারা মানুষের চেয়েও স্মার্ট। বস্তুত এই ভয়ই দেখিয়েছেন সদ্য গুগুল ছেড়ে দেওয়া প্রবাদপ্রতিম কৃত্রিম বুদ্ধি বিজ্ঞানী জিওফ্রে হিন্টন। তাঁর আশঙ্কা এই ঘটনাটি ঘটবে আগামী পাঁচ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যেই। এবং মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩

এবার প্রশ্ন, অতঃ কিম? আমরা যেদিকে নির্ধারকভাবে এগিয়ে গিয়েছি গত কুড়ি বছরে বা তিরিশ বছরে, তাতে কৃত্রিম বুদ্ধির অগ্রগতিতে শেকল পড়ানো অসম্ভব। তাহলে কীভাবে এই ব্যক্তিগত মানুষের মতো অ্যানথ্রোপোমর্ফিক যাবু রোবটগুলির হাতের পুতুল হওয়ার ভবিষ্যৎ এড়ানো সম্ভব? ব্যক্তিগত মানুষের ধারণা অর্থনীতির মহল থেকে আসলেও মনোবিদ্যার জগৎ সেটার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে অনেক সময়। মানুষের মস্তিষ্ক বাইরের যে কোনও সংবেদকে কোনও একটা পূর্বনির্ধারিত আদলের ছকে ফেলে গ্রহণ করে ও বিচার করে— এই ভাবনা এক ধরনের মনোবিদরা দীর্ঘদিন ধরে পোষণ করে এসেছেন এবং আধুনিক ব্যক্তিগত মানুষের ধারণা এর সাথে হাত ধরাধরি করেই গড়ে উঠেছে। এই পূর্বনির্ধারিত আদলের একটা অংশ মানুষ জন্মানোর পর তৈরি করা যায়। ফলে সেইটুকু ঠিকভাবে তৈরি করা প্রয়োজন এবং তার জন্য চাই সঠিক শিক্ষা, ছোট্ট বয়স থেকেই। এইভাবে ভাবার একটা ধরন চলে আসছে, সবাই মোটামুটি এইভাবে ভাবতেই অভ্যস্ত। আমরা এই পূর্বনির্ধারিত আদলকে বলতে পারি, চেতনা। শিক্ষা আনে চেতনা। এই চেতনা ঠিক করে আমাদের বহিস্থ সংবেদের গ্রহণ ও বিচার-কে। এইভাবেই তৈরি হয় ব্যক্তিগত মানুষ। বহু শত বছর ধরে লালনপালন করা এই 'স্বতঃসিদ্ধ'-কে কয়েক দশকে রূপায়ণ করে দেওয়া গেছে কম্পিউটার বা রোবটের মধ্যে।

এই 'স্বতঃসিদ্ধ'-কে প্রশ্ন না করলে, তাকে 'স্বাভাবিক' মনে করলে যাবু রোবটের ভাবী দাস হওয়া থেকে নিষ্কৃতি নেই বলেই মনে হয়। প্রথমত, যে পূর্বনির্ধারিত আদল বা চেতনার কথা বলা হল— সেটা আসলে কী, তা জানা প্রয়োজন। আমরা আগে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম (কথা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২২), এই চেতনা হল পারিপার্শ্বিকের অনুভবের সরলীকরণ। আমাদের মস্তিষ্ক এই সরলীকরণ ছাড়া কাজ করতে পারে না। মস্তিষ্ককেন্দ্রিকভাবে চলার বদলে, চেতনার সরলীকরণের বদলে অন্য অঙ্গুলির ভিন্নব্যক্তি-সংসর্গের মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিগত মানুষ অস্তিত্বকে পেছনে ফেলতে পারি এবং তার মাধ্যমে হারাতে পারি যাবু রোবটগুলিকে। যেমন, নানা ব্যক্তির পায়ে পায়ে সংযোগ, নানা ব্যক্তির আন্তঃহৃদয় সংযোগ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হাতে হাতে বা চোখে চোখে সংযোগ— ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মানুষ অস্তিত্বকে প্রশ্ন করা দরকার। প্রয়োজন রক্তমাংসের মানুষ। যে শুধু নিজের স্বার্থে চলে না, চলে অন্যের স্বার্থে, অন্যের কথায়, অন্যের প্রয়োজনে। ব্যক্তিগত ব্যক্তি মানুষ নয়, এই আড়ব্যক্তি মানুষ, যার সক্রিয়তা নির্ধারিত হয় তার যাপনের বাধ্যবাধ্যকতা দিয়ে, সম্পর্কের বাধ্যবাধকতা দিয়ে, যাপনের বাস্তুতন্ত্রে নিজের আংশিকতা দিয়ে— সে যাবু রোবটকে ঘেঁটে দিতে পারে।

তৃতীয়ত, ব্যক্তি মানুষকে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে দেখা-কে প্রশ্ন করা

দরকার। রোহিত ভেমুলার শেষ চিঠিতে ছিল, মানুষকে শুধু তার আশু পরিচয় দিয়ে দেখা ঠিক নয়, সে যে নক্ষত্রের ধূলিকণা দিয়ে তৈরি, সেটা মনে রাখা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, ব্যক্তি মানুষ একটা প্রকাশ, একটা অবয়ব। ভৌত এবং মনোসামাজিক অবয়ব। সে যেমন তার প্রকাশ বা অবয়ব দিয়ে সীমাবদ্ধ, জাগতিক, ঠিক তেমনি, তা তার অবয়ব মাত্র। গভীরে সে অসীম এবং অসীম সম্ভাবনা তার। ব্যক্তি মানুষের এই তুরীয় সম্ভাবনাকে সব সময় অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

চতুর্থত, এই অসীম সম্ভাবনাকে তার জাগতিক অস্তিত্বের সম্প্রসারণ হিসেবে ভাবা ভুল। আমরা সাধারণত অসীম সম্ভাবনাকে তার জাগতিক অস্তিত্বের সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। একটা গোদা টাইপের উদাহরণ দেওয়া যাক, যদিও এই উদাহরণে পুরোটা বোঝা যায় না। ধরা যাক, একজন ডাক্তার বাপ-মায়ের সন্তান, সে একজন কালজয়ী ডাক্তার বা জীববিজ্ঞানী হতে পারে। কিন্তু সে কালজয়ী খেলোয়াড় বা নাট্যকার হবে না বলে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু তুরীয় সম্ভাবনা জাগতিকতার অভিসরণ, সম্প্রসারণ বা বিকাশ নয়। তুরীয় সম্ভাবনা হল জাগতিকতার অপসরণ। ধরা যাক, কোনও একটা নতুন কিছু; কী করে তা বোঝা যাবে যে নতুন কিছু? যদি তার বর্ণ এবং তার গন্ধ মিলে যায় পূর্বতন কোনও একটা কিছুর সঙ্গে তাহলে? নাকি যদি বর্ণ একটা কিছুর সঙ্গে মেলে এবং গন্ধ আরেকটা কিছুর সঙ্গে মেলে তাহলে? বর্ণ এবং গন্ধ— এই দুই জাগতিকতার যদি অপসরণ হয়, তাহলেই সম্ভাবনা থাকে নতুন কিছুর, নইলে নয়। এটা আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে বললাম। ব্যক্তি মানুষের অসীম সম্ভাবনাকে তার ব্যক্তিগত পরিচয়ের বিকাশ হিসেবে দেখার কু-অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

পঞ্চমত, শিক্ষাকে প্রশ্ন করা দরকার। এখন যা দাঁড়িয়েছে, সব কিছুকেই পেডাগজিকাল বলা হচ্ছে। সবকিছুই যেন শেখার ব্যাপার। শিক্ষামূলক। শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার সীমাটিকেও বোঝা দরকার। একটা মানুষ যদি কেবল তার শিক্ষার ফসল হয়, তাহলে আজ বাদে কাল সে যাবু রোবটের দাস হতে বাধ্য। তার শিক্ষার বদলে তার যাপনের শক্তিই পারে তাকে যাবু রোবটের কবলমুক্ত করতে।

শমীক সরকার সমাজকর্মী, পেশায় গবেষক।

ভাবনা বড় হয়।

কথা ছোট হয়ে আসে...

কালি কলম ও ইজেল

ত্রয়োদশ সংখ্যা । একাদশ বর্ষ। পৌষ ১৪৩০ । জানুয়ারি ২০২৪

স ম্পা দ ক

আবু সোলাইমান দারানি

কা র্য ক রী স ম্পা দ ক

দেবারতি ঘোষ

স ম্পা দ ক ম ণ্ড লী

সাহীন, সায়নী সাহা, অভীক বক্সী, সৈনী সাহা

আজহার ও বিতান বসাক

প্র চ্ছ দ ও অ ল ঙ্ক র ণ

[ইজেল]

ইলাস্ট্রেশনগুলো ফ্রিপিক, অ্যাডোবি ফায়ারফ্লাই ও

কয়েকটি এআই টুলস দ্বারা তৈরি করা হয়েছে

প্রু ফ স ং শো ধ ন

প্রসিত দাস

কৃ ত জ্ঞ তা

'ওমিক্রন ল্যাব', 'লিপিঘর' এবং সমস্ত ছাপাখানার কর্মীবৃন্দ

আ মা দে র খোঁ জ

কালি কলম ও ইজেল

আই/জে-৭ কুষ্টিয়া হাউজিং এস্টেট, কুষ্টিয়া রোড

তিলজলা, কলকাতা — ৭০০০৩৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ক থা বা র্তা

kalikolomoeasel@yahoo.com

www.facebook.com/kalikolomoeasel

+৯১ ৮৯৮১৮ ২০৩৮০, +৯১ ৮৯৬১২ ৯৬৫২১

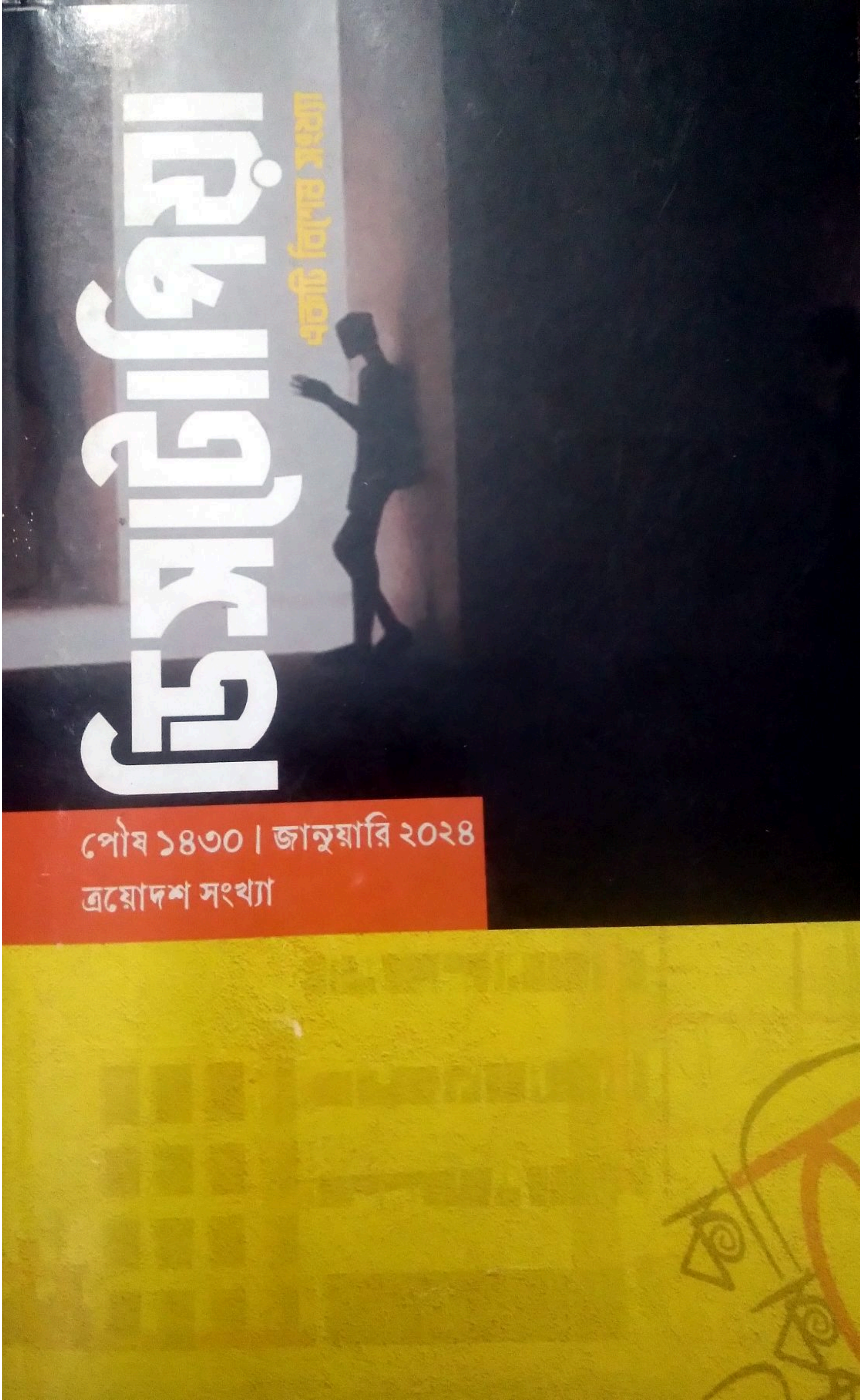
ডিসটোপিয়া
একটি বিশেষ সংখ্যা
পৌষ ১৪৩০ | জানুয়ারি ২০২৪
ত্রয়োদশ সংখ্যা